ধূসর জীবনানন্দ

বিনয় মজুমদার

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৭
তৃতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ১৭৫ টাকা

Dhusor Jeebonananda by Binoy Majumder Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudra-E-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205 Third Edition: October 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 175 Taka RS: 175 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-90757-8-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সূচিপত্র

এক.
জীবনানন্দ ও আমি : কিছু অসংলগ্ন ভাবনা ০৭
জীবনানন্দের এক দিক ১১
বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থে মিল ১৯
'অদ্ভুত আঁধার এক' : জীবনানন্দ দাশ ২৬
ধূসর জীবনানন্দ ৩৬

দুই.
কাব্যভাবনা ৪০
আধুনিক কবিতার হালচাল ৪৩
সৃষ্টির উপায় ৪৬
কবিতালেখা ৪৮
আমার ঘরে বসে লেখা প্রবন্ধ ৫০
সাধারণ মানুষের গদ্য কবিতা ৫১

তিন.
আপনারা হাসুন ৫৬

জীবনানন্দ ও আমি : কিছু অসংলগ্ন ভাবনা

আমাদের অঞ্চলে এক নাবিক আছে। নাবিকের নাম অরুণ। অরুণ হলো পাত্র, স্থান : ঠাকুরনগর, কাল : ১৯৮৪ খ্রি.।

একদিন অরুণকে আমি বললাম—'তুমি কবি জীবনানন্দ দাশের খুব ভক্ত, এবং জীবনানন্দের কবিতাসংগ্রহ তোমার কাছে আছে, তুমি টাকা দিয়ে কিনেছ? এ কথা কি সত্য?'

অরুণ জবাব দিল, 'সত্য কথা। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে, বিনয়দা?'

আমি হেসে বললাম, 'নাবিকদের নিয়ে প্রচুর কবিতা লিখেছেন তিনি, মানে জীবনানন্দ। এই হেতু আমি টের পেলাম, জানলাম।'

অরুণ শুনে গম্ভীর হয়ে বলল, 'তা সত্য, আমাদের নাবিকদের নিয়ে আর বিশেষ কেউ লেখেন নি।'

আমি বললাম, 'তবে শোনো, এক কামার—আমাদের গাঁয়ের এক কামার আর কী! কামারকে বললাম, তোমরা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম শুনেছ? কামার বলল, শুনেছি। আমি বললাম, কারণ তোমাদের নিয়ে অর্থাৎ কামারদের নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতা লিখেছেন।' অরুণ বলল, 'এ তো স্বাভাবিক।' আমাদের গ্রামে 'সিংহভবন' নামে একটি দালান আছে। আমি একদিন সিংহভবনের উঠোনে গিয়ে হাজির। একজন বৃদ্ধকে বললাম, 'সিংহভবন আপনার বাড়ি?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

আমি বললাম, 'আপনি অসীম সিংহের নাম শুনেছেন?'

সিংহমশাই বললেন, 'শুনেছি।'

আমি বললাম, 'যত সিংহ আছেন এদেশে, তারা পরস্পরের খবর রাখেন।'

প্রিয় অরুণ, এরপরে বাকিটা গোপন।

দুই.

পাঠক-পাঠিকারা জানেন যে, কোনো দৈনিক পত্রিকায় কবিতার বই সমালোচনার জন্যে দু-কপি দিতে হয়। একখানা ওই দৈনিক পত্রিকার লাইব্রেরিতে রেখে দিতে হয়। আর একখানা আসে সমালোচকের হাতে। সমালোচক পড়ে সমালোচনা লিখে দিলে সেই লেখা ছাপা হয়। একদিন হঠাৎই আমার এক বন্ধুর হাতে একখানা বই দেখে বললাম, 'কী বই, ওটা।' বন্ধুটি বইখানা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি, জীবনানন্দ দাশের।' আমি পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অবাক। ভিতরে লেখা আছে—'সমালোচনার জন্য দিলাম

আনন্দবাজার পত্রিকায়

—জীবনানন্দ দাশ।'

আমি বুঝলাম জীবনানন্দ দু-কপি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' দিয়েছিলেন আনন্দবাজারে। তার একখানা আমার এই বন্ধুটি পেয়েছে। যেভাবেই পাক 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'—গোপনীয়, খুব গোপনীয়।

তিন.

গোবরডাঙায় সন্দীপ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার একবার আলোচনা হয়েছিল। সন্দীপ এবং আমি একমত হলাম যে গত আড়াই হাজার বছরে যত বই লিখেছে ভারতীয়গণ, তার একটা মোটামুটি হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে দুইজন অমর কবি আছেন। এক শতাব্দীতে সারা ভারতে মাত্র দুজন। এই হিসেবটাই সত্য। সুতরাং হে বাঙালিগণ, কবি জীবনানন্দের কী দশা হবে আগামী দুই হাজার বছর পরে কে বলতে পারে?

কিন্তু জীবনানন্দ খুব খারাপ কবিতা লেখেন নি। কারো মনকে আনন্দিত করা যায় কীভাবে সে বিদ্যাও জানতেন।

চার.

জীবন যোগ আনন্দ—একসঙ্গে মিলে জীবনানন্দ। তা সত্ত্বেও জীবনানন্দ একটিও আনন্দের কথা লিখতে পারেন নি। সব বেদনার কবিতা লিখেছেন। এক জায়গায় কবি লিখলেন—'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।' এই কথা লেখার সময়ে 'জীবনের' পর্যন্ত লিখতেই কবির মনে পড়ল, আরে তার নামই তো জীবন। ফলে জীবনের সমুদ্র জীবনানন্দের সমুদ্র হয়ে গেল। এরকম অজস্রবার হয়েছে। হিসেব করে দেখেছি 'জীবন' শব্দটিই সবচেয়ে বেশিবার লিখেছেন কবি জীবনানন্দ। একবারই তার ধর্মপত্নীর কথা—'জীবনের লাবণ্যসাগর'। জীবনানন্দের ধর্মপত্নীর নাম লাবণ্য; সুন্দর লিখেছেন জীবনানন্দ। এইসব বাক্য তো আর বিদেশি কবিদের নকল করতে পারে না। 'কোথাও জীবন আছে জীবনের স্বাদ রহিয়াছে'। বলুন পাঠক-পাঠিকাগণ, এই 'জীবন' শব্দটি বারবার পড়ার ফলে মনে কেবল আনন্দ হয়।

পাঁচ.

কবি জীবনানন্দ দাশকে আমি কখনো সামনাসামনি দেখি নি। তাঁর ছেলে-মেয়েরা বোধহয় এখনো নিজস্ব কোনো দালান বানাতে পারে নি। হয়তো তারা এখনো ভাড়াটে হয়েই আছে।

আমি কৈশোরে গোঁফ দাড়ি গজাবার আগে, প্রায় প্রত্যহ দিলীপ গুপ্ত মশাই-এর সিগনেট বুক শপে যেতাম। দিলীপবাবু আমাকে একটানা আবৃত্তি করে শোনাতেন, তৎকালীন তরুণ কবিদের কবিতা—জীবনানন্দ, সমর সেন, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ আরো নানাজনের কবিতার বাছা বাছা অংশগুলি। আমি হাঁ করে শুনতাম। ফলে সপ্তাহে অন্তত একখানা এদের রচিত বই খানিকটা প্রেমে পড়েই কিনে ফেলতাম।

জীবনের আনন্দের, মানে জীবনানন্দের কোনো কবিতার বই তখন কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় কেনার জন্য পাওয়া যেত না। সুতরাং দিলীপ গুপ্ত মশাই জীবনানন্দের বাড়িতে গিয়ে একখানি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এনে আমাকে দিয়েছিলেন। যতখানি ব্যথাভারাতুর মন হলে জীবনানন্দের ব্যথাভারাতুর কবিতাগুলি ভালো লাগে, ততদূর ব্যথাভারাতুর মন আমার কখনো হয় নি। তবুও আমার কবিতাগুলির প্রতি কেমন যেন মায়া জন্মেছিল। ধূসর শালপাতায় জড়িয়ে যেমন মাংস বিক্রি করে, তেমনি দু-খানি ধূসর মলাটের মধ্যে কবির হৃদপিণ্ড জড়িয়ে আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল। কবে এই ধারণা আমার প্রথম হয়েছিল? আগে কেনার সঙ্গে সঙ্গে না কি এখন এই মুহূর্তে—তা আমি ঠিক জানি না।

পাঠক-পাঠিকাগণ...'ডাকবে না তাকে জানে/ পৃথিবীর ডাকে রাজকন্যারা জাগে না'... এই পঙ্‌ক্তিটি আমার রচিত যে কবিতায় আছে, সেটি জীবনানন্দ দাশ-এর কবিতার মতো করতে চেয়েছিলাম। প্রাণপণে জীবনানন্দ দাশ-এর কবিতা নকল করতে চেষ্টা করেছিলাম বেশ কয়েক বছর যাবৎ। ওই কবিতাটি ১৬ বার কাটাছাঁটা করেছিলাম। কোনো মতেই হৃদয়স্বাদু আর হয় না। একবার কাটাকুটি করে লিখলাম, 'রাজকন্যা' কবিতাটি, পরের দিন পড়ে মনে হলো জীবনানন্দর মতো হয় নি, বসলাম কাটাকুটি করতে—এই দ্বিতীয়বার কাটাছাঁটা, তৃতীয়বার কাটাকুটি করে, এক মাসব্যাপী কাটাছাঁটা করে তারপর থামলাম। বুঝলাম, জীবনানন্দের কবিতা নকল করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। জীবনানন্দকে নকল করা এত সহজ ব্যাপার নয়।

১৯৯৪

জীবনানন্দের এক দিক

কয়েকজন কবির কবিতা উদ্ধৃত করছি। কবি মধুসূদন লিখেছেন—

"রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।"

টীকা : মা মানে জন্মভূমি। মায়ের মন মানে বঙ্গভূমির মন। বঙ্গভূমির মন একটি কোকনদ ফুল। এই কোকনদ ফুল যেন মধুসূদন-হীন করো না। সংক্ষেপে এই কোকনদ যেন মধুহীন কোরো না। অর্থাৎ বাঙালিরা যেন কবি মধুসূদনকে মনে রাখে। তার মানে কবিতার এই পঙক্তিগুলি দ্ব্যর্থবোধক। কবিতাটির এই অংশের দুটি মানে হয় কোকনদ যেন মধুহীন না হয়—এক অর্থ। এবং বঙ্গভূমি (মা) যেন মধুসূদন-হীন না হয়—দ্বিতীয় অর্থ।

কবি মধুসূদন অন্যত্র লিখেছেন—

'লয়ে রচো মধুচক্র গৌড়জন যাহে/ আনন্দে করিব পান সুধা নিরবধি।'

টীকা : মধুচক্র মানে মৌচাক। মৌচাক বানাও—এ এক মানে। আবার লয়ে রচো মধুসূদন-চক্র—দ্বিতীয় মানে। এইভাবে মধুসূদন কবিতা লিখেছেন—দ্ব্যর্থবোধক কবিতা লিখেছেন।

এর পরে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা। কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন—

'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যপ্ত চরাচর
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর?'

টীকা : কবি ঈশ্বর গুপ্ত 'প্রভাকর' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই প্রভাকর পত্রিকা সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের কাছ থেকে প্রভা পাচ্ছে—এ হলো এক মানে। আবার প্রভাকর মানে সূর্য। এই ঈশ্বর সূর্য (প্রভাকর) সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বর সূর্যকে প্রভা দিচ্ছেন। এই সূর্যস্রষ্টা ঈশ্বর গোপন আছেন এ কথা কে বলে? এই সূর্যস্রষ্টা ঈশ্বর গুপ্ত আছেন এ কথা কে বলে? এই হলো দ্বিতীয় অর্থ, দ্বিতীয় মানে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এই কবিতাটিও দ্ব্যর্থবোধক। এর পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্ব্যর্থবোধক কয়েকটি কবিতা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'দেখ নাকি হায় বেলা চলে যায় শেষ হয়ে এলো দিন,
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ'

কবিতাটি 'পূরবী' নামক কাব্যগ্রন্থে আছে। এই পূরবী নামক কাব্যগন্থে রবীন্দ্রনাথের (রবির) শেষ বয়সের কবিতা—এ হলো এক মানে। আবার দিনশেষে সন্ধ্যায় বীণায় 'পূরবী' রাগিণী বাজায় লোকে। প্রভাতে বাজায় 'ভৈরবী' রাগিণী, সন্ধ্যায় বাজায় 'পূরবী' রাগিণী। আকাশে সূর্যদেবের পূরবী রাগিণী বাজানো চলেছে। আকাশে সূর্যদেবের (রবির) সন্ধ্যায়—দিনশেষের রাগিণী পূরবী রাগিণী বাজানো চলছে—এ হলো দ্বিতীয় মানে, দ্বিতীয় অর্থে। এইভাবে কবি রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থবোধক কবিতা লিখেছেন। 'রবি' শব্দটির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু দ্ব্যর্থবোধক কবিতা লিখেছেন। যেমন উদাহরণস্বরূপ—

'রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয়গিরিভালে'
আরো 'চাইল রবি শেষ চাওয়া তার কনকচাঁপার বনে।'

এরপরেই জীবনানন্দ দাশের কবিতা আলোচনা করছি। কবি জীবনানন্দ তাঁর পূর্বসূরীদের কবিতা কৈশোরেই পড়েছিলেন। নিজের নাম নিয়ে মধুসূদনের দ্ব্যর্থবোধক কবিতা জীবনানন্দ পড়েছিলেন; নিজের নাম নিয়ে ঈশ্বর গুপ্তর দ্ব্যর্থবোধক কবিতা জীবনানন্দ প্রথম যৌবনেই পড়েছিলেন, নিজের নাম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দ্ব্যর্থবোধক কবিতা

জীবনানন্দ পড়েছিলেন। সুতরাং জীবনানন্দ যখন কবিতা লেখা শুরু করলেন তখন জীবনানন্দের মনে পূর্বসূরীদের কবিতা ছিল।

কবি জীবনানন্দ যখন কবিতা লিখছেন তখন কী কাণ্ড ঘটত তা আমরা বুঝতে পারি। যেমন জীবনানন্দ যখন লিখছিলেন 'এ-সব পেয়েছি আমি; বাতাসের মতন অবাধ রয়েছে জীবন...' বাক্যের এটুকু লিখেই কবির মনে হলো "আরে, আমারো তো নাম 'জীবন', আরে আমারি তো নাম 'জীবন'। তাহলে দ্ব্যর্থবোধক বাক্য লেখা যায় কিনা দেখি"। এরূপ ভাবা খুবই স্বাভাবিক। এবং কবি জীবনানন্দ দেখলেন, দ্ব্যর্থবোধক কবিতা ও বাক্য লেখার জন্য কবির বিশেষ কসরত করতে হয় না— দ্ব্যর্থবোধক বাক্য লিখব না ভাবলেও বাক্য দ্ব্যর্থবোধক রয়ে যায়— 'জীবন' শব্দটি এমনই শব্দ। 'জীবন' শব্দটি এমনই এক শব্দ যাতে দ্ব্যর্থবোধক না করাই এক সমস্যা। খুব ক্বচিৎ কদাচিৎ একার্থবোধক বাক্য হয়, 'জীবন' শব্দ থাকা সত্ত্বেও। যেমন 'মোদের জীবনে যবে জাগে পাতাঝরা হেমন্তের বিদায় কুহেলির—'। এই বাক্যে 'জীবনে' দুই মানে করা যায় না। উপরিলিখিত চিন্তাগুলি কবি জীবনানন্দ নিশ্চয় করেছিলেন।

এবং দ্ব্যর্থবোধক কবিতা লেখার লোভ কবি জীবনানন্দ ছাড়তে পারেন নি। লোভেই বটে। কারণ দ্ব্যর্থবোধক বাক্য পাঠকের মনে থাকে সহজেই। নিজের নাম দিয়েই জীবন (জীবনানন্দ) কাজটি সহজে হাসিল করেছেন। তাঁর নাম জীবনানন্দ না বলে জীবনবাবুও বলা যায়।

এরপরে আমি উদ্ধৃতি দেওয়া শুরু করি। 'পিরামিড' নামক কবিতায়—

> ওলটি-পালটি যুগ-যুগান্তরে শ্মশানের ছাই
> জাগিয়া রয়েছে তব প্রেত-আঁখি—প্রেমের প্রহরা।
> মোদের জীবনে যবে জাগে পাতাঝরা
> হেমন্তের বিদায় কুহেলি— [পৃষ্ঠা ১৪]

টীকা : আমি 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' বইখানার দ্বিতীয় ভারবি সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ থেকে সকল উদ্ধৃতিগুলি দিচ্ছি। [পৃষ্ঠা ১৪] মানে এই বইখানির ১৪ পৃষ্ঠায় আছে, উদ্ধৃত বাক্যগুলি। 'টীকা' শব্দটির পাশে যা লিখেছি সেটুকু আমার লেখা। আর 'টীকা' শব্দটি যেখানে নেই সেটুকু কবি জীবনানন্দ দাশের লেখা।

'মৃত্যুর আগে' নামক কবিতায়—

বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ, মাঠে-মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা; অশথের ডালে-ডালে ডাকিয়াছে বক;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক, [পৃষ্ঠা ১৭]

টীকা : কবিতাটির মানে আমরা বুঝেছি যারা জীবনানন্দের এই সব নিভৃত কুহক। এই 'কুহক' কী? জীবনানন্দের কবিতাই কুহক। এটা জীবনানন্দের অভিমত। কবিতার এই পঙ্‌ক্তিগুলি আলোচ্যমান গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় আছে। কবিতাটির এই অংশটুকু দ্ব্যর্থবোধক হয়েছে। 'বোধ' নামক কবিতায়—

পুকুরের পানা শ্যাওলা—আঁশ্‌টে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে
গিয়েছে জড়ায়ে;
—এই সব স্বাদ;
—এ-সব পেয়েছি আমি; বাতাসের মতন অবাধ
বয়েছে জীবন,
নক্ষত্রের তলে শুয়ে ঘুমায়েছে মন
একদিন [পৃষ্ঠা ২১]

টীকা : বাতাসের মতন অবাধ বয়েছে জীবনানন্দ—এক মানে, বাতাসের মতন অবাধ বয়েছে জীবন—দ্বিতীয় মানে। 'নির্জন স্বাক্ষর' কবিতায়—

শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে?
আমি ঝ'রে যাবো—তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে,
[নির্জন স্বাক্ষর/ পৃষ্ঠা ২৩]

রয়েছি সবুজ মাঠে—ঘাসে—
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হ'য়ে আকাশে-আকাশে;
জীবনের রঙ তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে! সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা—[নির্জন স্বাক্ষর/ পৃষ্ঠা ২৩]

টীকা : মাঠ ঘাট সবুজ, আকাশ নীল। জীবনানন্দের রঙ? জীবনানন্দের রঙ তবু ফলানো কি হয়? এই জিজ্ঞাসা করেছেন কবি জীবনানন্দ। রঙ তো বানান, ফলান, সৃষ্টি করেন বিশ্বস্রষ্টা। জীবনানন্দের বানানো রঙ

তবে কী? এর পরেই কবি লিখেছেন 'পৃথিবীতে নাই তাহা।' অর্থাৎ জীবনানন্দের বানানো রঙ এই পৃথিবীতে নেই। অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টারই আরেক নাম জীবনানন্দ। এরকম একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর এক মানে—মানুষের, পৃথিবীর সব মানুষের জীবনের রঙ। মানুষের জীবনের রঙ তো বানান বিশ্বস্রষ্টা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাও মনে পড়ে—'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না/ সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।' নানা রঙের দিন—সে আবার কী? তেমনি মানুষের জীবনের রঙ—সে আবার কী? মানুষের, পৃথিবীর মানুষের জীবনের রঙ যাই হোক এই রঙ তবু ফলানো কি হয়'। ফলানোর কর্তা বিশ্বস্রষ্টা। এ হলো এক মানে; আরেক মানে জীবনানন্দের রঙ, জীবনানন্দের তৈরি রঙ। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা—বিশ্বস্রষ্টাই জীবনানন্দ। বিশ্বস্রষ্টা বানান নি সে রঙ—'পৃথিবীতে নাই তাহা।' সে রঙ যখন পৃথিবীতে নেই তখন বোঝা যায় বিশ্বস্রষ্টার ব্যাপার এই রঙ বিষয়ক ব্যাপারটি।

কতবার বর্তমান হয়ে গেছে ব্যথিত অতীত—
তবুও তোমার বুকে লাগে নাই শীত
যে-নক্ষত্র ঝরে যায় তার।
যে-পৃথিবী জেগে আছে, তার ঘাস—আকাশ তোমার।
জীবনের স্বাদ ল'য়ে জেগে আছে, তবু মৃত্যুর ব্যথা দিতে।
পারো তুমি, [নির্জন স্বাক্ষর/ পৃষ্ঠা ২৪]

নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়,
নক্ষত্রের মতন হৃদয়
পড়িতেছে ঝরে—
ক্লান্ত হয়ে শিশিরের মতো শব্দ ক'রে।
জানোনাকো তুমি তার স্বাদ—
তোমারে নিতেছে ডেকে জীবন অবাধ,
জীবন অগাধ। [নির্জন স্বাক্ষর/ পৃষ্ঠা ২৫]

আমি চলে যাবো—তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে; [পৃষ্ঠা ২৫]

টীকা : এখানে স্পষ্টই লেখা আছে 'আমি চলে যাবো'। কবি চলে যাবেন, মরে যাবেন; 'তবু জীবন অগাধ/তোমারে রাখিবে ধরে সেই দিন পৃথিবীর 'পরে'। কবি মরার পরে জীবন তোমারে রাখিবে ধরে...পৃথিবীর 'পরে। এই জীবন ব্যক্তিটি বিশ্বস্রষ্টা যিনি তোমারে রাখবেন ধরে পৃথিবীর 'পরে। এই মানেটা একটু স্পষ্ট হলো। এই মানে বিষয়ক চিন্তাটা কখনোই পুরো বোঝা যাবে না। ইশারায় ইঙ্গিতে থেকে যাবে।

'ক্যাম্পে' নামক কবিতায়—

তাদের মতন নই আমিও কি?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমাকেও ডাকে নি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
ওই ঘাইহরিণীর মতো? [পৃষ্ঠা ৩৩]

টীকা : এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে জীবন মানে জীবনানন্দ নিজে—জীবনানন্দের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে। ফলে কবিতায় এই অংশটুকুর দুটি মানে হয়েছে।

টীকা : এর পরে আমি আর টীকা লিখব না। শুধু কবিতার অংশগুলি উদ্ধৃত করব। এই কবিতাগুলিতে 'জীবন' শব্দের মানে পাঠকপাঠিকাগণই ভেবে নেবেন।

আমার বুকের প্রেম ওই মৃত মৃগদের মতো
যখন ধুলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে? [ক্যাম্পে/ পৃষ্ঠা ৩৩]
এই ব্যথা—এই প্রেম সব দিকে র'য়ে গেছে—
কোথাও ফড়িঙে-কীটে—মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবন [ক্যাম্পে/ পৃষ্ঠা ৩৪]

'পাখিরা' নামক কবিতায়—

যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ-লক্ষ মাইল ধরে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হ'য়ে।
কোথাও জীবন আছে—জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,
কোথাও নদীর জল রয়ে গেছে— [পৃষ্ঠা ৪২]